The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXV, 2019 (pp. 57 - 68)
Published in December, 2023

নির্বাসিতের আত্মকথা: ব্রিটিশ ভারত ও আন্দামান জেলের চিত্র (১৯০৮-১৯২১)

মোহাম্মদ মীর সাইফুদ্দীন খালেদ চৌধুরী*

প্রতিপাদ্যসার

দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসে চরমপন্থী দলসমূহের উত্থান ও কার্যাবলি স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামকে অনন্য মাত্রা যুক্ত করে। ব্রিটিশ বিরোধী নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ইংরেজদের বিবেককে জাগ্রত করতে একেবারেই ব্যর্থ হয়। তখন সন্ত্রাসবাদের মধ্যেই অরবিন্দ, বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ প্রমুখ সাফল্যের হাতছানি দেখতে পাচ্ছিলেন। বঙ্কিম সাহিত্যও বিপ্লবীদের আদর্শগতভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বিশেষত ১৯০৫ সালের লর্ড কার্জনের 'বঙ্গভঙ্গ' এর সিদ্ধান্তে বিক্ষুব্ধ বাঙালি সমাজে বিপ্লববাদের উৎপত্তি। বিশ শতকের প্রথম দশকে বাংলায় আত্মপ্রকাশ করা বিপ্লবী সংগঠনের অন্যতম যুগান্তর। বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ, হেমচন্দ্র কানুনগো, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ এ দলের প্রধান সংগঠক। ১৯০৬ সালে যুগান্তর দলটি গঠিত হয়। ব্রিটিশ সরকার ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল কলিকাতার মানিকতলায় বাগান বাড়ী হতে গ্রুপটিকে গ্রেপ্তার করেন। এ সকল বন্দীদের প্রথমে আলীপুর জেলে পাঠানো হয়। ১৯০৯ সালে চূড়ান্ত বিচারের রায়ে উল্লাসকর, বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র ও উপেন্দ্রনাথের 'যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর' দণ্ড হয়। এ সময়ে উপেন্দ্রনাথকে অন্যান্য রাজবন্দীদের সাথে আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারের জেলে পাঠানো হয়। বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সুদীর্ঘ বারো বৎসর জেলজীবন নিয়ে লিখেছেন *নির্বাসিতের আত্মকথা*। তিনি ব্রিটিশ ভারত ও আন্দামান জেলে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এখানে তুলে ধরেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে এটির আলোকে ব্রিটিশ ভারত ও আন্দামান সেলুলার জেলের প্রশাসন, পরিবেশ, খাবার, শাস্তিসহ বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করা হয়েছে।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ সরকারের ভারত শাসন দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের জন্য সুখকর ছিল না। এদেশের জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ জনগণ দেশকে রক্ষার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিশ শতকে

*সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ইতালি, আয়ারল্যান্ড, পোলান্ডের ন্যায় দক্ষিণ এশিয়ায়ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা হতে বিভিন্ন গুপ্ত সমিতি অনিবার্যভাবে সৃষ্টি হয়েছে, যার অন্যতম সংঘটন যুগান্তর।[১] এটি প্রথমে পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীতে বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, হেমচন্দ্র কানুনগো, অরবিন্দ ঘোষসহ বেশ কিছু একই ভাবাদর্শের তরুণকে নিয়ে বিপ্লবী দল যুগান্তর গঠিত হয়। এ যুগান্তরের একজন সক্রিয় সদস্য উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়[২]। ১৯০৮ সালের এপ্রিলে ব্রিটিশ সরকার পুরো গ্রুপকে গ্রেফতার করে প্রথমে আলীপুর প্রেসিডেন্সি জেলে প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে বিচারের পর কয়েকজনকে যাবজ্জীবন করাদণ্ড দিয়ে আন্দামানে পাঠানো হয়। উপেন্দ্রনাথও আন্দামানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দন্ডিত কয়েদী হিসেবে প্রেরিত হন। আলীপুর ও আন্দামান জেলে নিজের স্মৃতি তিনি *নির্বাসিতের আত্মকথা* [৩] গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। এখানে লেখক নিজের কারা জীবন ও রাজনৈতিক জীবনের স্মৃতি উপস্থাপন করেছেন। লেখকের কারা স্মৃতি আলীপুরের প্রেসিডেন্সি জেল ও আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারের সেলুলার জেল দুই ভাগে বিভক্ত। এটিতে তৎকালীন সময়ের রাজনীতি, সমাজ ও ব্রিটিশ ভারতে আন্দামান কারাগারের বাস্তব চিত্র উঠে এসেছে। বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে ব্রিটিশ শাসনামলে দক্ষিণ এশিয়ার সমাজ, রাজনীতি, সরকারের প্রতিহিংসামূলক আচরণ ও কৌশল, কারাগারের পরিবেশ এবং বন্দীদের সুযোগ সুবিধা প্রভৃতি তাঁর লিখায় স্থান পেয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে তৎকালীন সময়ের রাজনীতি, রাজবন্দীদের অবস্থা এবং আন্দামান জেলের পরিবেশ ও প্রশাসন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, গুপ্তসমিতি ও সংঘটন যুক্ত হয়। এসকল সংঘটনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শোষণের হাত থেকে মুক্তি ও স্বদেশের স্বাধীনতা। এ বিষয়ে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় অসংখ্য প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ সকল বিপ্লবীদের আত্মজীবনী, ইতিহাস ও জেল জীবন নিয়েও অনেক লিখা রয়েছে। কিন্তু ব্রিটিশ ভারতের ভয়ংকর জেল হচ্ছে আন্দামান জেল। যার উপর লেখনি অপ্রতুল। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ ভারতের জেল চিত্র তথা আন্দামান জেলের চিত্রের মাধ্যমে আলোচ্য সময়ে ব্রিটিশ শাসকদের চরিত্র আমরা অনুমান করতে পারি। অন্যদিকে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য এদেশীয় জনগণের প্রবল আকাঙ্ক্ষাও প্রতিফলিত হয়। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সমুন্নত রাখার জন্য এসকল গবেষণা সাধারণ মানুষকে স্বদেশ প্রেমে উজ্জীবিত করবে যা এ গবেষণার লক্ষ্য। *নির্বাসিতের আত্মকথা* কারা- ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি বাংলাদেশে 'জেল ইতিহাস' এর চর্চায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করি। সুতরাং এ ডিসকোর্সটির আলোচনায় গবেষণা কর্মটির যৌক্তিকতা রয়েছে।

প্রস্তাবিত গবেষণাটি মূলত মৌলিক (Primary) উৎসের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে দ্বৈতয়িক (Secondary) উৎসের সহায়তা নেয়া হয়। মৌলিক উৎসের মধ্যে অপ্রকাশিত রিপোর্ট, রেকর্ড, বিভিন্ন অফিসিয়াল ডকুমেন্ট প্রভৃতি। বইপত্র, সংবাদপত্রসহ বিভিন্ন তথ্যসূত্র হলো দ্বৈতয়িক উৎস। প্রাথমিক ও দ্বৈতয়িক উৎসসমূহের তথ্যাবলী Cross Check করা হয় এবং কোয়ালিটেটিভ পদ্ধতিতে গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করা হয়।

১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে সাপ্তাহিক *যুগান্তর* পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয়। দেবব্রত (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ) ও ভূপেন (স্বামী বিবেকানন্দের ছোটভাই) সম্পাদক এবং আবিনাশ ম্যানেজার হিসেবে কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে দেবব্রত 'নবশক্তি'তে যোগ দিলে বারীন্দ্র কুমার ঘোষ ও উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় পত্রিকাটি সম্পাদনা শুরু করেন। পত্রিকাটি শুরুতেই ব্রিটিশ শাসকদের বাঁধার সম্মুখীন হয় এবং সম্পাদক ভুপেন ও প্রিন্টার বসন্ত কুমারকে গ্রেপ্তার করা হয় (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৪,৮)। পরবর্তীতে বারীন্দ্র বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে

বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি ও তাঁর একশজন অনুসারী অস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্র সংগ্রহ করে বোমা তৈরী করেন এবং বিপ্লবী দলের গোড়াপত্তন করেন যার নাম যুগান্তর।

প্রাথমিক বিপ্লবী দলের মধ্যে হেমচন্দ্র কানুনগো অন্যতম সংগঠক। তিনি বিদেশে গমণ করেন এবং রাজনৈতিক ও সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি রাশিয়ান E9migrE9 হতে প্যারিসে প্রশিক্ষণ নেন। ১৯০৮ সালের জানুয়ারিতে ফিরে এসে কলিকাতার মানিকতলায় বারীন্দ্রনাথের বাগান বাড়ীতে ধর্মীয় স্কুল ও বোমার ফ্যাক্টরি স্থাপন করেন। ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল কেনেডি হত্যার কয়েক ঘন্টার মধ্যে গ্রুপটিকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের পর বন্দীদের প্রথমে লালবাজার পুলিশ কোর্টে হাজির করা হয়। পরবর্তীতে আলিপুরের ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে হাজির করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট বার্লি (Birly) এর নির্দেশনানুযায়ী বন্দীদের আলিপুর জেলে পাঠানো হয়। লেখক আলীপুর জেলের বর্ণনায় লিখেন:

> সাত হাত দৈর্ঘ্য ও পাঁচ হাত প্রশস্ত কুঠুরিতে তিনজনকে রাখা হয়েছে এবং কামরাটির এককোণে দুটি গামলা হচ্ছে শৌচাগার। কুঠুরির সামনে একটি ছোট বারান্দা। সেখানে হাতমুখ ধোয়া ও স্নানাহার করার ব্যবস্থা রয়েছে। বারান্দার সামনে সরু লম্বা উঠানের শেষ প্রান্তেই সুউচ্চ প্রাচীর (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৬)।

আলীপুর জেলে দৈনিক খাবারের মধ্যে সকালে লাপসি, যা হচ্ছে ফেন মেশানো ভাত। সাড়ে দশটায় এক বাটি রেঙ্গুন চালের ভাত, অড়হর ডাল, পাতা ও ডাঁটা সিদ্ধ এবং একটু তেঁতুল গোলা। সন্ধ্যায়ও একই খাবার সরবরাহ করা হয়। জেলের ৪৪ ডিগ্রীতে তিনটি কামরায় প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন কয়েদীকে রাখা হয়েছে। পরবর্তীকালে ডাক্তারের নির্দেশে একটি ওয়ার্ড খালি করে সবাইকে রাখা হয়। এ সময়ে ডাক্তার বন্দীদের জন্য বাইরের ফলমূল, মিষ্ঠান্ন পাবার ব্যবস্থা করেন। রাজবন্দী সুশীল সেনের পিতা ও অন্যান্য বন্দিগণের আত্মীয়রা প্রায়ই আম, কাঁঠাল ও মিষ্ঠান্ন পাঠাত। কলিকাতার 'অনুশীলন সমিতি'র[৪] ছেলেরাও মাঝে মাঝে ঘি, চাল, মসলা ও মাংস সরবরাহ করেছে। এজন্য প্রাথমিক পর্যায়ে জেলের নিষ্ঠুর বাস্তবতা রাজবন্দীরা বুঝতে পারেননি। কিন্তু ধীরে ধীরে কারাগারের কঠোরতা ও নির্মম বাস্তবতা তাঁরা অনুধাবন করেন। লেখকের মতে, 'তাঁর দেড় বৎসরের বাচ্চাকে কোলে নিয়ে আদর করতে ব্যর্থ হয় তখন কারাগারের প্রকৃত বাস্তবতা অনুভব করেছেন' (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪২-৪৩)।

অন্যদিকে কলকাতায় আসামীদের রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচার শুরু হয় এবং মিথ্যা সাক্ষীর জন্য বিপ্লবীদের মধ্যে নরেন্দ্র গোস্বামীকে রাজসাক্ষী করা হয়। নরেন সরকারী সাক্ষী হওয়ার পর ইউরোপীয় প্রহরীর তত্ত্বাবধানে পৃথকভাবে রাখা হয়। কেউ তাকে আক্রমণ করার ভয়ে জেলারগণ সর্বদা সর্তক থাকত। বন্দীদের মধ্যে কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন ব্যাপারটিকে সহজভাবে নেয়নি। তারা অসুস্থতার কথা বলে হাসপাতালে অবস্থান করেন এবং কৌশলে পিস্তল সংগ্রহ করেন। সত্যেন রাজসাক্ষী হওয়ার ইচ্ছা নরেনের নিকট প্রকাশ করেন। কিন্তু পুলিশকে কি কি বলতে হবে তা দু'জনে পরামর্শ করে ঠিক করার জন্য নরেনকে হাসপাতালে ডেকে পাঠায়। নরেন হাসপাতালে আসার পর সত্যেন ও কানাইলাল নরেনকে গুলি করে হত্যা করেন (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪৭)। এ ঘটনার পর কানাইলাল ও সত্যেনসহ সকল বন্দীকে পুনরায় জেলে ৪৪ ডিগ্রিতে হস্তান্তর করা হয়। এ সময়ে হাসপাতালে যাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ এবং অসুখ হলে জেলের কুঠুরিতেই

পড়ে থাকতে হয়। কেউ কারও সাথে কথা বলা নিষেধ এবং সারাদিন কুঠুরির মধ্যে খাওয়া ও অন্যান্য কাজ সারতে হয়। কারাগারে দেশীয় প্রহরীর পরিবর্তে ইউরোপীয় প্রহরী দেওয়া হয় এবং রাত্রে একদল গোরা সৈন্য জেলের ভিতর ও বাইরে পাহারা দেয়। জেল কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হয় যে, বিপ্লবীরা জেল হতে পালাতে পারে। জেলের অন্য অংশ হতে কোন লোক রাজবন্দীদের ৪৪ ডিগ্রিতে প্রবেশ করতে পারত না। প্রথম দুই কুঠুরিতে কানাইলাল ও সত্যেনকে আবদ্ধ করে রাখা হয়। অন্যান্য কয়েদীগণ পাঁচ-সাত দিন পর পর এক কুঠুর হতে অন্যকুঠুরীতে বদলী হতে পারত। সকালে ও বিকালে আধঘন্টা করে সবাই ঘুরা ফেরা করলেও পরস্পরের কাছে যাওয়া এবং কথা বলা সম্ভব হত না। জেলে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সত্যেন ও কানাইলাল এর বিচারের চুড়ান্ত রায়ে মৃত্যুদন্ড হয়। কানাইলাল এর ফাঁসির দিন নির্ধারিত হলে তাঁর সাথে দেখা করার জন্য জেলার সবাইকে সুযোগ করে দেয়। সাক্ষাতের সময় কানাইলালের প্রশান্ত ও দুশ্চিন্তামুক্ত মুখাবয়ব দেখে বিপ্লবীগণ বিস্মিত হন। ফাঁসির সময় তাঁর বীরত্বপূর্ণ মুখচ্ছবি ও কালীঘাটের শ্মাশানে জনতার উচ্ছ্বসে দেখে বৃটিশ সরকারও ভয় পায়। লেখকের ভাষায়:

> কিন্তু ফাঁসির সময় তাহার নির্ভীক, প্রশান্ত ও হাস্যময় মুখশ্রী দেখিয়ে জেলার কর্তৃপক্ষরা বেশ একটু ভ্যাবাচাকা হইয়া গেলেন। একজন ইউরোপীয় প্রহরী আসিয়া চুপি চুপি বারীন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমাদের হাতে এ রকম ছেলে আর কতগুলি আছে'। যে উন্মত্ত জনসঙ্ঘ কালীঘাটের শ্মশানে কানাইলালের চিতার উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে ছুটিয়া আসিল, তাহারাই প্রমাণ করিয়া দিল যে, কানাইলালে মরিয়াও মরে নাই (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪৯)।

জনতার এমন উচ্ছ্বাসের জন্য সত্যেনকে ব্রিটিশ সরকার গোপনে ফাঁসি দিতে বাধ্য হয়। কলিকাতায় জেলের কুঠুরিতে থাকাকালীন সময়ে আলিপুর জজের কাছে অন্যান্য আসামীদের বিচার আরম্ভ হয়। বিপ্লবীরা টাকার অভাবে ঠিকমত মামলা পরিচালনা করতে পারেনি। শুধু চিত্তরঞ্জনদাশ বিপ্লবীদের পক্ষে প্রায় বিনা খরচে মামলা পরিচালনা করেন। বারীন্দ্র ঘোষের ইউরোপে জন্ম হওয়ায় সরকার বিচারে বিদেশী অধিকারের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তিনি তা নাকচ করে দেন। মামলা চলাকালীন সময়ে কোর্টে যাওয়া আসার পথে হাত কড়ার ভিতর দিয়ে শিকল বাঁধা থাকত। কয়েদীগণকে দুপুরে শৌচকর্ম করতে হলে হাতকড়া অবস্থায় রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যেত। কোর্টের মামলায় বিভিন্ন ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং উকিলরা তাদের জেরা করছে যা সত্যিই দুঃখজনক ছিল। লেখকের ভাষায়:

> সাক্ষীরা একে একে আসিয়া আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া যাইত; আমাদের মনে হইত যেন থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছি। উকিল-ব্যারিস্টারের জেরা, পুলিশ-কর্মচারীদের ছুটাছুটি, সবই যেন এক বিরাট তামাশা। আমাদের হাস্য- কোলাহলে মাঝে মাঝে আদালতের কাজকর্ম বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইত। জজ সাহেব আমাদের হাতকড়া লাগাইবার ভয় দেখাইতেন, ব্যারিস্টাররা ছুটিয়া আসিয়া অরবিন্দ বাবুকে অনুরোধ করিতেন, ''ছেলেদের একটু থামতে বলুন"। অরবিন্দ বাবু নির্বিকার প্রস্তর মূর্তির মত এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন; ব্যারিস্টারদের অনুরোধের উত্তরে জানাইতেন যে, ছেলেদের উপর তাহার কোনও হাত নাই (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫০-৫১)।

১৯০৯ সালের মে মাসে এ রাষ্ট্রদ্রোহী মামলার রায় ঘোষণা করা হয়। এ রায়ে বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের ফাঁসি হয় এবং দশজনের যাবজ্জীবন দীপান্তর। কয়েকজন আসামীকে পাঁচ থেকে সাত বৎসরের জেল এবং অরবিন্দ ঘোষসহ অন্যান্যরা খালাস পায়। কলিকাতার সেসন্স কোর্টের রায়ের পর জেলে সবাইকে পায়ে বেড়ি পরানো হয় এবং কুঠুরিতেই আবদ্ধ রাখা হয়। এ সময়ে বিপ্লবীদের উপর জেলখানায় অত্যাচার আরো বেড়ে যায়। তাদের সঙ্গে আদালতে ও জেলখানায় সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দুর্ব্যবহার করত। পুলিশ ইন্সপেক্টর শামসুল আলম সহ অন্যান্যরা পদোন্নতির আশায় মিথ্যা স্বাক্ষ্য জোগাড় করে বিপ্লবীদের ফাঁসানোর চেষ্টা করত। কিন্তু কোর্ট ইন্সপেক্টর আবদুর রহমানকে ভদ্রলোক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বিপ্লবীদের দ্বীপান্তরের সাজা হওয়ায় তাঁর সহানুভূতি প্রকাশের কথা লেখক উল্লেখ করেন। লেখক জেলের চিত্র বর্ণনায় দেওয়ালের লিখা একটি কবিতার উদ্ধৃতি দেন, যা নিম্নরূপ:

ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে পাট শরীর হইল কাঠ
সোনার বরণ হৈল কালি।
প্রহরী যতেক বেটা বুদ্ধিতে বোকা পাঁঠ
দিনরাত দেয় গালাগালি (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৬)।

রাজবন্দীরা কলিকাতার সেসন্স কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেন এবং ১৯০৯ সালের নভেম্বরে হাইকোর্টের রায় আসে। উল্লাস কর, বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র ও উপেন্দ্রনাথের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড হয়। অন্যান্য আসামীদেরকে ভারতের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জেলে পাঠানো হয়। আন্দামান নিকোবর ম্যানুয়াল অনুসারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বলতে পঁচিশ বৎসর কারাবাসকে বুঝায়।

রাষ্ট্রদ্রোহী মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হবার কিছু দিন পর সিভিল সার্জন এসে সবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন এবং অসুস্থতার জন্য উপেন্দ্র ও সুধীর ছাড়া অন্যান্যদের আন্দামানে পাঠানো হয়। ছয় সপ্তাহের মধ্যে তাদেরকেও খিদিরপুর ডক হয়ে জাহাজে করে আন্দামানে পাঠানো হয়। এ সময়ে এসকল রাজবন্দীদের মনের অবস্থা নাজুক ছিল কিন্তু তাঁরা মানসিকভাবে দৃঢ়তার পরিচয় দেন। রাজবন্দীদের অবস্থা সম্পর্কে লেখক বলেন:

> জাহাজ উঠাইয়া দিয়া একজন সার্জেন্ট বিদ্রুপ করিয়া বলিল, 'Now say native land farewell' আমরা হাসিয়া বললাম 'Ar revoir' বলিলাম বটে কিন্তু ফিরিবার আশাটা নিতান্তই জবরদস্তি মনে হইতে লাগিল (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৯)।

রাজবন্দীদের জাহাজটি কলিকাতার খিদিরপুর ডক ইয়ার্ড হতে আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় এবং তিনদিন তিনরাত অবস্থানের পর পোর্ট ব্লেয়ার এসে পৌঁছে। কয়েদিরা নিজেদের বিছানাপত্র নিয়ে আন্দামানের জেলে প্রবেশ করেন। আন্দামান জেলের প্রধান শ্বেতাঙ্গ শ্রীমান ব্যারি।[৫] তিনি কয়েদিকে শায়েস্তা করতে সিদ্ধহস্ত। প্রথম দেখায় উপেন্দ্রনাথদের বলেন, 'So here you are at last; well there but mind you dont talk' (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬০)। শ্রীমান ব্যারি তার রুক্ষমূর্তি ও শায়েস্তা করার দক্ষতার জন্য কয়েদীদের কাছে সাক্ষাৎ যমদূত। ব্যারি বলেন, 'জেলখানা আমার রাজ্য, এটা ভগবানের এলাকাভুক্ত নহে। ত্রিশ বৎসর ধরিয়া আমি পোর্ট ব্লেয়ারে আছি। একদিনও এখানে ভগবানকে আসিতে দেখি নাই' (উপেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬০)। তাঁর কর্মকাণ্ড এটিই প্রমাণ করে। শুধু যীশুখ্রিষ্টের জন্মদিনে সে শান্তসৌম্য মূর্তি ধারণ করে।

আন্দামান জেলের বন্দী ব্রাহ্মণদের পৈতা কেড়ে নেয়া হত এবং উপেন্দ্রনাথের পৈতাও কেড়ে নেয়া হয়। অপরদিকে মুসলমানের দাড়ি ও শিখদের চুলের গোছা অক্ষত থাকে। জেলখানায় জাতিভেদ প্রথা না থাকলেও এ নিয়ম ছিল। পৈতার প্রতিবাদে উত্তর প্রদেশের একজন কয়েদি দুই মাস অনশন করে মৃত্যুবরণ করেন। আন্দামান জেলে বহু জাতি একসাথে বসবাস করে। বাঙালি, হিন্দুস্তানি, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, বর্মি, মাদ্রাজি সবাই একসাথে বসবাস করেছে। হিন্দু ও মুসলমান সংখ্যা প্রায় সমান। জেলখানায় হিন্দু-মুসলমান দলাদলিতে মুসলমানেরা দাড়ি ও হিন্দুরা টিকি রাখা শুরু করে। মুসলমানেরা আলীর সাথে হনুমানের যুদ্ধ, শিবের সাথে মহম্মদের লড়াই ও সোনাভান বিবির কেচ্ছা প্রভৃতি কাল্পনিক আখ্যান পাঠ করে। অন্যদিকে আর্যসমাজীরাও জেলের মধ্যে প্রচার কার্য চালায়। রাজনৈতিক বন্দীরা এসব বিভক্তিতে যোগ দেয়নি।

অন্যদিকে রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যেও বিভক্তি দেখা যায়। মারাঠা নেতারা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম' এর সমালোচনা করেন। তাদের মতে, তিনি ভারতের জনগণের সাত কোটির কথা বলেছেন, ত্রিশ কোটির কথা বলেননি বলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ অতি সংকীর্ণ। পাঞ্জাবি আর্যসমাজী নেতাগণ বাঙালিদের বিরোধিতা করেন। রাজা রামমোহনকে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের সুপারিশের জন্য দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করেন। মারাঠি নেতারা মনে করেন ভারতবর্ষ তাদের নেতৃত্বেই একতাবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। পেশোয়ারের বংশধরেরাই ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণ করায় সচেষ্ট ছিল। উপেন্দ্রনাথের ভাষায়, 'হিন্দুস্তানি ও পাঞ্জাবিরা গোঁয়ার, বাঙালি বাক্যবাগীশ, মাদ্রাজি দুর্বল ও ভীরু। একমাত্র পেশোয়ার বংশধরেরাই মানুষের মত মানুষ নানা যুক্তি তর্কের ভিতর দিয়া এই সুরই ফুটিয়া উঠিত' (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭১)।

আন্দামানে জেলখানার প্রধান কাজ নারিকেলের ছোবড়া পিটাইয়া তার বাহির করা ও দড়ি পাকানো, নারিকেল ও সরিষার ঘানিতে পিষে তেল তৈরী করা, নারিকেলের মালা হতে হুকাঁর খোল প্রস্তুত করা । এছাড়া অল্প বয়স্ক ছেলেদের বেতের কারখানার কাজ করানো হয়। ঘানি ঘুরানো ও ছোবড়া পেটানোই কঠিন কাজ। প্রতিদিন সকালে প্রত্যেক কয়েদিকে বিশটি নারিকেলের শুষ্ক ছোবড়া দেয়া হয়। একখণ্ড কাঠের উপর রেখে মুগুর দিয়ে পিটালে নরম হয়ে আসে এবং উপরের খোসা ফেলে পানিতে ভেজানো হয়। পুনরায় পিটালে ভুসি ঝরে কেবলমাত্র তারগুলোই বের হয়ে আসে। এ তার রৌদ্রে শুকাইয়া পরিস্কার করা হয়। দৈনিক এক সেরের একটি গোছা প্রস্তুত করাই কয়েদির কাজ। সরিষার ঘানি দুই প্রকার। একটি হচ্ছে গরু বা অন্যান্য পশুর পরিবর্তে মানুষকে ব্যবহার করা এবং অন্যটি হলো হাতে ঘানি ঘুরিয়ে তেল তৈরী করা। প্রতিদিন একজন কয়েদিকে দশ পাউন্ড সরিষার তেল বা ত্রিশ পাউন্ড নারিকেল তেল প্রস্তুত করতে হয়। রবিবার বন্ধের দিনে নীচতলা হতে বালতি দিয়ে জল উঠিয়ে দোতলা ও তিনতলার বারান্দা নারিকেলের ছোবড়া দিয়ে পরিস্কার করা বাধ্যতামূলক। বন্দীদের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি লেখকের নিম্নোক্ত মন্তব্যে স্পষ্ট হয়। তিনি বলেন:

> অপরাধের তারতম্য অনুসারে কয়েদীদের ভিন্ন শ্রেণীভূক্ত করিবার প্রথা সরকারি পুথিঁতে আছে বটে কিন্তু কার্যকালে তাহা ঘটিয়া উঠে না। কিসে জেলের আয় বৃদ্ধি হয়, সুপারিটেন্ডেন্ট হইতে আরম্ভ করিয়া চুনোপুটি অফিসার পর্যন্ত সকলের দৃষ্টি সেই দিকে। কয়েদি মরুক আর বাঁচুক, কে তাহার খবর রাখে? ভারতবর্ষে লোকের অভাবও নাই, আর

> মাসে মাসে জাহাজ বোঝাই করিয়া দরকার মত কয়েদী সরবরাহ করিবার জন্য বিলাতী বিচারকেরও অভাব নাই (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬৩)।

আন্দামান জেলের খাবার বলতে রেঙ্গুন চালের ভাত ও মোটা রুটি। তরকারি হিসেবে কচুর গোঁড়া, ডাটা ও পাতা, চুপড়ি আলু, খোসাসহ কাঁচা কলা ও পুইশাক, ছোট কাকঁর ও ইদুরনাদ এক সঙ্গে সিদ্ধ করা হয়। কারো শাস্তি হলে খাবার হচ্ছে কঞ্জি (Penal diet)। গুড়া চাউল ফুটন্ত গরম জলে ঢেলে দিয়ে প্রস্তুতকৃত খাদ্যই কঞ্জি। এ ধরনের নিম্ন মানের খাবার ও অখাদ্য খেতে বন্দীদের বাধ্য করা হয়। ভারতীয় জেলে বন্দীদের খাবারের প্রকৃত চিত্র ইতিহাসবিদ Madhurima Sen এর উদ্ধৃতিতে পাওয়া যায়। তিনি লিখেন:

> The Poverty of the Indian Prisoner's diet Could be inferred from the fact that Where as the government spent four anna per head daily on an ordinary European's diet in jail, the Indian diet not cost more then one anna per head (Madhurima sen, 2007, 47).

ভারতীয় জেলের মধ্যেও কয়েদিদের এটুকু অধিকার দেওয়া হতো না। আন্দামানের জেলে এসব নিয়মের কোন বালাই ছিল না। বিপ্লবী বীণা দাস (১৯১১-১৯৮৬) তাঁর আত্মজীবনীতে কারাগারে বন্দীকালীন সময়ে জেলের বিভিন্ন অনিয়মের মধ্যে খাবারের বিষয়টিও উল্লেখ করেন। ব্রিটিশ জেলে কয়েদীদের ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য তিনি দৈনন্দিন খাবারকেও দায়ী করেন (বীণা দাস ২০০৫, ৪৯)।

ভারতের জেলে মেট ও কালপাগড়ীর ন্যায় সেলুলার জেলের Warder, Petty officer, Tindal ও জমাদার রয়েছে। সাধারণ কয়েদীরা পাঁচ থেকে সাত বৎসর সাজার পর এসব পদে উন্নীত হয়। এসব জেলে ছোট বড় সব কাজের ভার ও কর্তৃত্ব তাদের উপর ন্যস্ত। এরা প্রত্যেক কয়েদীকে তীক্ষ্ণ নজরে রাখে এবং সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতির জন্যও কঠোর শাস্তির প্রদানের মাধ্যমে জেলখানার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করে। শাস্তির ধরন উপেন্দ্রনাথের লিখায় সুন্দরভাবে উঠে এসেছে। তিনি বলেন:

> রামলাল ফাইলে টেড়া হইয়া বসিয়াছে। দাও ইহার ঘাড়ে দুইটা রদ্দা; মুস্তফা আওয়াজ দিবামাত্র খাড়া হয় নাই। অতএব উহার গোফ ছিড়িয়া লও। বাকউল্লার পায়খানা হইতে ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছে, অতএব তিন ডান্ডা লাগাইয়া উহার পশ্চাদ্দেশ ঢিলা করিয়া দাও (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬৬)।

জেল প্রশাসন লঘু পাপে গুরুদণ্ড প্রদান করে কঠোরভাবে জেলের শৃংখলা রক্ষা করত। এরা কয়েদীদের নানারূপ অত্যাচারের মাধ্যমে পয়সা কড়ি ও অন্যান্য সুবিধার ভাগ নেয়। উপেন্দ্রনাথ ও উল্লাসকর একই জায়গায় রবিবারের কাজের সময় কাছাকাছি এসে কথা বলার চেষ্টা করলে প্রহরী পিটে কিল ও মুখে ঘুষি দেয়। উপন্দ্রেনাথ ঘানিতে তেল পিষতে অস্বীকার করায় তাকে জেলার শাস্তিস্বরূপ কুঠুরিতে বন্ধ রেখে হাতকড়ি, বেড়ি ও কঞ্জি (Penal diet) এর ব্যবস্থা করেছে। এরূপ কঠিন শাস্তির মধ্য দিয়েই জেলের কয়েদিগণের দিন অতিবাহিত হয়।

আন্দামান জেলে প্রতিদিন ঘানিতে কাজ করতে করতে রাজবন্দীরা হাঁপিয়ে উঠতো এবং জেল কর্তৃপক্ষও তাদের সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ করত। এর প্রতিবাদে রাজবন্দীরা ধর্মঘটে যোগ দেয়। ধর্মঘটের শাস্তি হিসেবে চারদিন কঞ্জি ও সাতদিন দাড়া হাত কড়ি প্রদান করে। বন্দিদের সাজার পর সাজা ও নানা বেড়ির

পর কুঠুরিতে বন্দী রাখা হয়। ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী বন্দীদের কুঠুরিবাসে সাধারণ কয়েদিদের ন্যায় সুযোগ না রেখে নির্জন কারাবাসের ব্যবস্থা করা হয়। তিন মাসেরও বেশী কুঠুরিতে বাসের পর কয়েদিগণের মধ্যে অনেকের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। বিভিন্ন রোগের প্রার্দুভাবের জন্য কয়েকজনকে করোনেশন উৎসবের সময় জেলের বাহিরে Settlement এ পাঠায়। এ সময়ে কয়েদিগণকে বাইরে রোদ বৃষ্টিতে কাজ করতে হয়। জেলের বাহিরে কয়েদীদের খাবার ঠিকমত পাওয়া যায় না এবং চিকিৎসারও ব্যবস্থা নেই। এ সকল ঘটনার পরম্পরায় ইন্দুভূষণের আত্মহত্যা ও উল্লাসকরের উম্মাদ হওয়ায় রাজবন্দীদের সংকল্প আরো দৃঢ় হয়। ভাল খাওয়া পরা, পরিশ্রম হতে অব্যাহতি ও পরস্পরের সাথে মেলামেশার সুবিধার দাবীতে কয়েদিরা ধর্মঘটকে আরো তীব্র করেছে। জেলারদের শাস্তি ও অন্য কৌশল নিষ্ফল হয়ে যায়। এমতাবস্থায় দশ-বারোজনকে নারিকেল পাহারায় জেলের বাইরে পাঠানো হয়। জেলখানায় ধর্মঘট অব্যাহত থাকায় নন্দগোপাল ও ননীগোপালকে vipes দ্বীপে একটি ছোট জেলে বদলি করা হয়। কিন্তু ননীগোপাল সেখানে আহার বন্ধ করেন। এজন্য কর্তৃপক্ষ অন্যান্য কয়েদিদের বাইরের জেলে পাঠানোর পরিকল্পনা ত্যাগ করে। কয়েদিরা নানা অসুবিধার জন্য জেলের বাইরের কাজে অস্বীকৃতি জানায় এবং তিনমাসের সাজা নিয়ে ফিরে আসে। জেলের ধর্মঘটও ঐ সময় ভেঙ্গে যায়। কিন্তু ননীগোপালের মরণপণ অনশনে জেলে পুণরায় Hunger strike ছড়িয়ে পড়ে। আন্দামান জেল কর্তৃপক্ষের সর্তকতার মধ্যেও ইন্দুভূষণ, উল্লাসকর ও ননীগোপালের কথা দেশের সংবাদপত্রে আলোচনা হয়। সরকার বাধ্য হয়ে তদন্তের জন্য Dr. Lukis কে পাঠান। Dr. Lukis-এর রিপোর্ট কখনও প্রকাশিত হয়নি কিন্তু রাজবন্দীগণ কিছু দিনের জন্য নিষ্কৃতি পায়।

দ্বিতীয়বারের ধর্মঘট ননীগোপালের কর্মকাণ্ড নিয়ে শুরু হয়। সে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায়। জেল কর্তৃপক্ষ চটের কাপড়ের পরিবর্তে জাঙ্গিয়া পড়লে তা-ও ছিনিয়ে নেয় এবং তাঁকে চটের জাঙ্গিয়া দেয়া হয়। ননীগোপাল এসবের পরিবর্তে নগ্ন হয়ে বসে থাকে এবং বলতে থাকে, 'Naked we come out of our mather's womb and naked shall we return' (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭৯)। গলার টির্কেট ভেঙ্গে ফেলে নির্বিকার বসে থাকে। জেলের চীফ কমিশনার আসলেও সম্মান করে না। তাঁর যুক্তি হচ্ছে ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থে আইন তৈরী করছে। যা এ দেশের লোকের সাথে সম্পর্ক নেই। সুতারাং এ আইন মেনে চলারও বাধ্যবাধকতা নেই। উপেন্দ্রনাদের ভাষায়:

> ইংরাজ যখন নিজের খুশিমত আইন-আদালত বানাইয়াছে সে সকল ব্যবস্থার সহিত যখন তাহার দেশের লোকের কোনও সম্বন্ধ নাই, তখন কেন যে সে এই সমস্ত আইন ন্যায়তঃ ধর্মতঃ মাথা পাতিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য এ প্রশ্নের মীমাংসা লইয়াই ননীগোপাল ব্যস্ত। তাহার ধর্মবুদ্ধি যাহাতে সায় দেয় না। শুধু প্রাণটা বাঁচাইবার জন্য সে কেন সে কাজ করিতে যাইবে প্রাণ রাখিতে রাখিতেই যেখানে প্রানান্ত হইতে হয়, সেখানে প্রাণের মূল্য কতটুকু? (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

কলিকাতার পত্রিকায় আন্দামানের রাজনৈতিক কয়েদিদের সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় কর্তৃপক্ষ বিপ্লবী বারীন্দ্রদের সন্দেহ করে। আন্দামান জেলের চীফ কমিশনারের আদেশে রাজবন্দীরা বাহির হতে জেলে ফেরত আসে। এবার কয়েদিদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ বোমা বিষ্ফোরণ ঘটানো এবং সরকারী স্টিমার ছিনিয়ে পালানোর কাল্পনিক অভিযোগ করেছে। এটি প্রমাণের জন্য পুলিশের একজন সাক্ষী বোমা বানানোর নমুনা সংগ্রহ

করে। ভারত সরকারের প্রতিনিধি Sir Reginald Craddock পোর্ট ব্লেয়ার পরিদর্শনের সময় রাজবন্দীরা তাদের অভিযোগ জানানোর চেষ্ঠা করে। কিন্তু চিফ কমিশনার তাদের বাধা দিয়ে বলেন তোমরা বাহিরে রাজদ্রোহের পরামর্শ দিয়েছ বলে অভিযোগ রয়েছে। রাজবন্দীরা নিজেদের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের চেষ্টা করেন। এ সময় রাজবন্দী ননীগোপাল তাঁর নিজের পক্ষে যুক্তি দিলেন এবং জবাবে ক্র্যাডক বলেন তুমি সরকারের শত্রু, তোমাকে মারিয়া ফেলাই উচিত ছিল (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮১)। এ উক্তিতে রাজবন্দীদের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের নীতিই প্রতিফলিত হয়েছে। এভাবে নিরাশ হয়ে সকল রাজবন্দী ও সাধারণ কয়েদি কাজ-কর্ম ছেড়ে দেয় এবং কারা কর্তৃপক্ষও শাস্তি দিয়ে হাঁপিয়ে উঠে। কারাগারের ডেপুটি কমিশনার Lowis ধর্মঘটের কারণ অনুসন্ধান করতে আসেন। তিনি রাজবন্দীদের অভিযোগের উত্তরে ভারত সরকারের আদেশের কথা বলেন। পোর্ট ব্লেয়ার কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্ঠা করেন। জেলের অভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃংখলা রক্ষার জন্যই এই শাস্তির নীতি বলে তিনি মন্তব্য করেন। লেখকের ভাষায়:

> আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছিল তাহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, ইন্ডিয়া গভর্ণমেন্টের ইচ্ছা যে, আমাদের প্রতি সাধারণ কয়েদী অপেক্ষা ভাল ব্যবহার করা না হয়; এ বিষয়ে পোর্ট ব্লেয়ারের কাহারও কোনও হাত নাই। ''কিন্তু সাধারণ কয়েদীর যে সমস্ত সুবিধা আছে, আমাদের সে সমস্ত কিছুই নাই। সাধারণ কয়েদী লেখাপড়া জানিলে অফিসে ভাল কাজকর্ম পায়; তাহারা লেখাপড়া না জানিলেও ওয়ার্ডার, পেটি অফিসার হইতে পারে। আমরা যে সে সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত। অপরে পাঁচ বৎসর পরে মাসে বা-রো আনা করিয়া মাহিনা পায় এবং দশ বৎসর পরে নিজে উপার্জন করিয়া খাইতে পারে, আর আমাদের যে চিরদিনই জেলে পঁচিয়া মরিবার ব্যবস্থা।" Lowis সাহেব উত্তর করিলেন যে, এ সমস্ত ব্যবহার ও দায়িত্ব ইন্ডিয়া গভর্ণমেন্টের। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন ''সাহেব ভাল করিবার কোন অধিকারই তোমাদের নাই; শুধু কি সাজা দিবার অধিকারটুকুই হাতে রাখিয়াছিলেন? (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮১-৮২)।

স্যার রেজিনাল ক্র্যাডক ও লুইসের কথায় ভারতীয় সরকার ও পোর্ট ব্লেয়ার কর্তৃপক্ষের প্রকৃত চরিত্র প্রকাশিত হয়েছে। ডেপুটি কমিশনার রাজবন্দী উল্লাসকরের আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে বলেন, 'Ullaskar is one of the nobelist boys I have ever seen, but he is too idealistic' (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮২)। তবুও তিনি সরকারী চাকুরে হিসেবে অভ্যন্তরীণ শৃংখলা রক্ষার নামে রাজবন্দীদের কারো সাজা একমাস, কারো তিন মাস, কারো ছয়মাস বৃদ্ধি করলেন (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

কিন্তু সাধারণ কয়েদিগণও ক্রমান্বয়ে ধর্মঘটের দলে যোগ দেয় এবং এতে জেলের কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটে। রাজনৈতিক কয়েদিদের মধ্যে মেয়াদী কয়েদী ৭/৮ জনকে দেশের জেলে পাঠানো হয়। পোর্ট ব্লেয়ার কারাগারের জেলার স্বয়ং ধর্মঘট ছাড়ার অনুরোধ করে। কারাগারের মেয়াদী কয়েদীদের দেশের জেলে পাঠানো এবং অন্যান্যদের সুযোগ সুবিধার আশ্বাস প্রদান করেন। এ সুযোগে রাজবন্দীরাও জেলারকে দু'মাসের সময় বেঁধে দিয়ে ধর্মঘট প্রত্যাহার করেন। অল্পদিনের মধ্যে বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র, ঢাকার পুলিনবিহারী ও সুরেশচন্দ্র এবং নাসিকের সাভারকার ভাতৃদ্বয় ও যোশী ব্যতিত অন্যান্য রাজবন্দীদের দেশের জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আন্দামান

জেলের রাজবন্দীদের সংখ্যা কমিয়ে কর্তৃপক্ষ অভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃংখলা রক্ষা এবং জেলের পরিবেশ পরিস্থিতি অনুকূলে রাখতে সক্ষম হয়।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় 'লাহোর ষড়যন্ত্র' এর ভিত্তিতে 'গদর' দলের পঞ্চাশ জন পোর্ট ব্লেয়ার জেলে প্রেরিত হয়। রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত পল্টনের অনেক শিখ সৈন্য এবং বাংলাদেশের পনের/ষোল জন বন্দীও প্রেরিত হয়। এতে রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আন্দামান জেলে বিভিন্ন কারণে তাদের সাথে কাজ, খাবার এবং অন্যান্য বিষয়াদি নিয়ে কারা কর্তৃপক্ষের সাথে মনোমালিন্য ধর্মঘটে রূপ নেয়। জেল কর্তৃপক্ষ তাদের ভবিষ্যতে সদব্যবহারের আশ্বাস দিয়ে ধর্মঘট প্রত্যাহার করায়। আমেরিকার 'গদর' পত্রিকার সম্পাদক জগৎরাম ও কয়েকজন বন্দী রবিবারের কাজের প্রতিবাদ করেন। এটির শাস্তি হিসেবে জগৎরামসহ কয়েকজনকে ছয়মাসের বেড়ি ও কুঠুরিবদ্ধ হওয়ার দণ্ড প্রদান করা হয়। জেলের অতিরিক্ত শাস্তি এবং দিন দিন কঠোরতার মাত্রা বৃদ্ধিতে সবাই কাজ ত্যাগ করেন। একজন বৃদ্ধ শিখকে পিটানোর ফলে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় পৃথ্বিসিংহের আমরণ অনশন এবং যক্ষা রোগে কয়েকজন শিখের মৃত্যু উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাছাড়া একজন কয়েদী সীসাখণ্ড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। এ সকল রাজবন্দীদের প্রতি আন্দামান জেল কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের মাত্রা দিনদিন সীমা অতিক্রম করে। ছত্র সিংহ ও অমর সিং কে জেল কর্তৃপক্ষ দীর্ঘ দুই বৎসর পিঁজরার মধ্যে আবদ্ধ রাখে। এ সকল মাত্রাতিরিক্ত অত্যাচার, নিপীড়ন ছিল পোর্ট ব্লেয়ারে নিত্য দিনের চিত্র। লেখকের ভাষায়:

> যাঁহারা মরিলেন তাঁহারা ত বাঁচিয়া গেলেন; যাঁহারা পাগল হইয়া জীবন্ত মরিয়া রহিলেন, তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। বালেশ্বর মকদ্দমার যতীশচন্দ্র পাল তাঁহাদের অন্যতম। কুঠুরিবদ্ধ অবস্থায় তিনি একেবারে উম্মাদ হইয়া যান। তাঁহাকে পাগলা গারদে পাঠান হয়; পরে ভারতবর্ষে লইয়া আসা হয়। এখন বহরমপুর পাগলাগারদে তাহার দিন কাটিতেছে (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮৪)।

রাজবন্দীদের ধর্মঘটে সরকারের সাথে আপোষ হয় এবং বারীন্দ্র, উপেন্দ্রনাথসহ বেশ কিছু বন্দীকে আলাদা সুযোগ সুবিধার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। বারীন্দ্রকে বেত কারখানার তত্ত্বাবধায়ক, হেমচন্দ্রকে পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ ও উপেন্দ্রনাথকে ঘানি ঘরের মোড়লের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁরা নিজেরা রান্না করে খাওয়ার অধিকার পায়। জেলের ভিতর ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করে বারীন্দ্রকে তত্ত্বাবধায়ক ও হেমচন্দ্রকে বাঁধাই বিভাগের অধ্যক্ষ করা হয়। তাঁদেরকে মাসিক এক টাকা বেতন দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্ত রাজবন্দীদের জন্য কিছুটা স্বস্তিদায়ক। আন্দামান জেল কর্তৃপক্ষের শত চেষ্ঠার পরও অত্যাচারের অনেক সংবাদ ভারতের পত্রিকায় মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়। এজন্য কর্তৃপক্ষ রাজবন্দীদের প্রতি কিছুটা নমনীয় আচরণ করে।

এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জার্মান বা প্যারিস শহরের বিশ মাইলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং এমডেন জাহাজ মাদ্রাজে গোলাবর্ষণ আন্দামানের সাধারণ কয়েদিরাও অবগত হয়। ব্রিটিশদের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রচুর ক্ষতি হয়। জেলের ঘানির তেল গুদামেই পড়ে আছে এবং ঘানি চালানো বন্ধ হয়েছে। কয়েদির নিকট হতে নানা কৌশলে যুদ্ধের জন্য টাকা সংগ্রহ (War loan) করা হয়। জেলের শত্রু-মিত্র সবাই মিলে জার্মানদের জয় কামনা করছে। জেলের সুপার রাজবন্দীদের টাইমস্ পত্রিকার সাপ্তাহিক সংস্করণ পড়ার জন্য সরবরাহ

করত। কিন্তু টাইমসের বর্ণনানুযায়ী ইংরেজ ও ফরাসি সৈন্যের দৈনিক অগ্রসরের বর্ণনা অবিশ্বাস্য হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ কয়েদিরা ইংরেজদের স্বপক্ষে কেউ কথা বললেই রেগে যেত। টাইমস্ পত্রিকার অসত্য কাহিনী দিয়ে প্রকৃত সত্য চাপা দেওয়া ঘটনা সবাই বুঝতে সক্ষম হয়। মেসোপটেমিয় পল্টন হতে বিদ্রোহী পাঠান ও শিখ সৈন্যদের আন্দামানে পাঠানো হয়। পাঠানদের মুখে অদ্ভুত সব গল্প শোনা যায়। গদর দলের শিখরা কয়েদি হওয়ার পর জেলের মধ্যে বিশৃংখলার আশংকায় জেল পাহারায় দেশী বিদেশী সৈন্য নিয়ে আসা হয়। ব্রিটিশ কর্তৃক এমডেন জাহাজ ধরা পড়ার পর পোর্ট ব্লেয়ার আক্রমণের মানচিত্র পাওয়ার গুজবও শোনা যায়। পোর্ট ব্লেয়ার রক্ষায় সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি ও কামান মোতায়েন করা হয়। পোর্ট ব্লেয়ারের মিলিটারি পুলিশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিখ রয়েছে। জেলের কয়েদি গদর দলের শিখ এবং শিখ সৈন্যদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন না করার জন্য কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেষ্ট থাকে। জেল কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ সফল হয়। ব্রিটিশ সরকার বিশ্বযুদ্ধের নাজুক সময়ে শান্তি, শৃংখলা রক্ষা ও কারাগারের পরিবেশ স্থিতিশীল রাখতে সক্ষম হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সরকার সিদ্ধান্ত নেয় রাজবন্দীদের মধ্যে যারা পেনাল কোর্ডের ৩০২ ধারা অনুসারে অপরাধী নয় এবং জেলে সাত বৎসর সাজা ভোগ করেছে তাদের মুক্তি দেয়া হবে। এটি কয়েদিদের জন্য একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা।

উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের মতে:

> এ পর্যন্ত কোনও যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত রাজনৈতিক কয়েদি পোটব্লেয়ার হইতে বাঁচিয়া ফিরে নাই। ১৮৫৭ সালে যাহারা সিপাহী বিপ্লবের পর পোর্টব্লেয়ারে গিয়াছিল তাহাদের সকলকেই সেখানে একে একে দেহরক্ষা করিতে হইয়াছে। থিবের সহিত যুদ্ধের পর যে সমস্ত ব্রহ্মদেশীয় কয়েদি আসিয়াছিল তাহারাও কেহ ছাড়া পায় নাই। আজ আমাদের জন্য যে ইন্ডিয়া গভর্ণমেন্টের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় আরম্ভ হইবে একথা সহসা বিশ্বাস করিতে সাহস হইল না। কিন্তু না বিশ্বাস করিয়াই বা কি করি? প্রাণ যে ফুলিয়া ফুলিয়া হাঁপাইয়া উঠিতেছে (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯২-৯৩)।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার প্রায় একবৎসর পর জেল সুপার রাজবন্দীদের মুক্তির সংবাদ প্রদান করে। বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র ও উপন্দ্রেনাথকে বেঙ্গল গর্ভমেন্টের আদেশ অনুযায়ী আলীপুর জেলে পাঠানো হয়। পোর্ট ব্লেয়ারের জেল হতে ছাব্বিশ জন রাজবন্দীকে একটি জাহাজে করে দেশে পাঠানো হয়। আলীপুর জেলে পৌঁছানোর পর তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হয়। এভাবে লেখকের দীর্ঘ বার বৎসর জেল জীবনের অবসান ঘটে।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *নির্বাসিতের আত্মকথা*-য় জেল জীবনের স্মৃতি অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। এ বর্ণনায় বৃটিশ শাসনামলে ভারতীয় বিশেষত আন্দোমানের সেলুলার জেলের প্রকৃত চিত্র রয়েছে। ব্রিটিশ শাসনামলে জেলের নিয়মকানুন, কাজের ধরন, শাস্তি, থাকার সুবিধা ও অসুবিধা, চিকিৎসা ব্যবস্থা, জেলার ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের আচরণ লেখক দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। অপরদিকে জাতীয়তাবাদী কয়েদিদের অটুট মনোবল এবং তাদের প্রতি কারা কর্তৃপক্ষের বৈষম্যমূলক আচরণও উঠে এসেছে। রাজবন্দীগণ ভারতীয়

জেলে মাত্রাতিরিক্ত নিপীড়ন, অন্যায় ও অত্যাচারের স্বীকার হতেন। পোর্টব্লেয়ারেও তাদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত নির্যাতন করা হতো। এরূপ নির্যাতন হতে মুক্তির জন্য অনেক রাজবন্দী মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করেছেন। এদেশ তথা ভারতের স্বাধীনতার জন্য জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ অসংখ্য রাজনৈতিক নেতা-কর্মী নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র ও শোষণের প্রকৃতরূপ লেখকের বর্ণনা হতে আমরা অনুধাবন করতে পারি। এক কথায় উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপধ্যায় নিজের কারা স্মৃতির মাধ্যমে এ দেশে ব্রিটিশ শাসকদের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। ব্রিটিশ শাসনামলে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া তথা বাংলার কারাগারের প্রকৃত ইতিহাস পূর্ণাঙ্গভাবে তুলে ধরা সময়ের দাবী, যা ব্যাপক গবেষণার দাবী রাখে।

টীকা

১। যুগান্তর দল ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লববাদী গুপ্ত সংস্থা। এটির জন্ম ১৯০৬ সালে এবং প্রধান কার্যালয় ৯৩/এ, বাবুবাজার স্ট্রীট, কলকাতা। অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লোস কর দত্ত প্রমুখ দলটির নেতৃত্ব দেন। পরবর্তীতে ঢাকায়ও এটির শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী এ দলের সদস্য ছিলেন।

২। গুপ্ত সংঘটন যুগান্তরের একজন সক্রিয় কর্মী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯০৮ সালে তিনি যুগান্তরের অন্যান্য সদস্যদের সাথে কলিকাতার মানিকতলা থেকে বন্দী হন। ১৯০৯ সালের মে মাসে বিচারের চুড়ান্ত রায়ে আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারের সেলুলার জেলে যাবজ্জীবন সাজা প্রাপ্ত হন। তিনি সুদীর্ঘ ১২ বৎসর জেলে বন্দী ছিলেন।

৩। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারা স্মৃতি নিয়ে লেখা *নির্বাসিতের আত্মকথা* যা ১৯২১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতেও একাধিকবার প্রকাশিত হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বইটির প্রশংসা করেছেন বলে লেখক উল্লেখ করেছেন। এটির ১৯৭৬ সালে নবম সংস্করণ হিসেবে ন্যাশনাল পাবলিকেশন হতে প্রকাশিত সংখ্যায় মুখবন্ধ লিখেন সৈয়দ মুজতবা আলী। সর্বশেষ ২০১৪ সালে র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা থেকে এটি পুনঃমুদ্রণ করা হয়।

৪। ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবের গুপ্ত দলসমূহের অন্যতম কলকাতার 'অনুশীলন সমিতি'। ১৯০২ সালের ২৪ মার্চ সতীশ চন্দ্র বসু ও প্রমথনাথ মিত্রের প্রচেষ্ঠায় এটি গঠিত হয়। পরবর্তীতে ঢাকায়ও এটির বিস্তৃতি ঘটে।

৫। তিনি জাতিতে আইরিশ ও রোমান ক্যাথলিক। উচ্চতা পাঁচ ফুট ও তিন ফুট চওড়া এবং আন্দামানের জেলখানায় ত্রিশ বৎসর ধরে চাকুরী করেন।

গ্রন্থপঞ্জি

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। *নির্বাসিতের আত্মকথা*। কলকাতা: র‍্যাডিকেল ইম্প্রেশন, ২০১৪।

Madhurima sen. *Prisons in Colonial Bengal (1838-1919),* Kolkata: Satish Mukherjee Road, THEMA, 2007.

বীণা দাস। *শৃংখলা ঝংকার*। কলকাতা: র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ২০০৫।